৭

নির্যাতন এবং পীড়াদায়ক আচরণ থেকে মুক্তির অধিকার

মোঃ শহিদুজ্জামান

এই অধ্যায়ে আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী কর্তৃক নির্যাতনের চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এবং দেখানো হয়েছে, এই মনোভাব বদলানোর জন্য সরকারের পক্ষ থেকে কোনো কার্যক্রম গ্রহণ করা হয়নি। এখানে আলোচনা করা হয়েছে, বাংলাদেশ আন্তর্জাতিক চুক্তি এবং সংবিধানের অধীনে এর দায়িত্ব পালন করতে ব্যর্থ হয়েছে।

বাংলাদেশের সংবিধান, নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক সনদ (ক্যাট) এবং নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদের বাধ্যবাধকতা অনুসারে সব ধরনের নির্যাতন এবং নিষ্ঠুর, অমানবিক ও হেয়কর আচরণ সম্পূর্ণভাবে নিষিদ্ধ। উপরন্তু নির্যাতন এবং পীড়াদায়ক আচরণ সম্পর্কিত অভিযোগের তদন্ত করা এবং অভিযুক্তদের বিচারের সম্মুখীন করতে রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশ দায়বদ্ধ।[১] এসব মানদণ্ডে এবং রাষ্ট্রীয় আইন ও উচ্চ

১ সংবিধানের ৩৫(৫) অনুচ্ছেদঃ কোনো ব্যক্তিকে যন্ত্রণা দেয়া যাবে না কিংবা নিষ্ঠুর, অমানবিক বা লাঞ্ছনাকর দণ্ড দেয়া যাবে না কিংবা কারও সাথে অনুরূপ ব্যবহার করা যাবে না। অনুচ্ছেদ ৩১ঃ কোনো ব্যক্তির জীবন, স্বাধীনতা, দেহ, সুনাম বা সম্পত্তির হানি ঘটে এমন কোনো ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে না।

আদালতের রায়ে নিষিদ্ধ হলেও দেশজুড়ে ব্যাপকমাত্রায় নির্যাতনের ঘটনা ঘটেই চলেছে।

২০০৮ সালের প্রায় পুরোটা জুড়েই (১৭ ডিসেম্বর পর্যন্ত) নির্যাতনকে অনুমোদন ও নির্যাতনকারীর দায়মুক্তির বিধান সংবলিত জরুরি বিধিমালা বলবৎ ছিল। এ অবস্থায় নির্যাতনবিরোধী আন্তর্জাতিক বাধ্যবাধকতার ক্ষেত্রটির প্রসার ঘটাতে নির্যাতনবিরোধী চুক্তির ঐচ্ছিক প্রটোকল (অপশোনাল প্রটোকল টু দ্য ক্যাট) কিংবা আন্তর্জাতিক ফৌজদারি আদালতের সংবিধি (স্টাটিউট ফর দ্য ইন্টারন্যাশনাল ক্রিমিনাল কোর্ট) অনুমোদনের কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। একইভাবে নির্যাতনবিরোধী রক্ষাকবচ সংক্রান্ত উচ্চ আদালতের নির্দেশনা অথবা এ সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির বিধানকে রাষ্ট্রীয় আইনে অন্তর্ভুক্ত করার কোনো উদ্যোগ নেয়া হয়নি। তবে এ সময়ে হাইকোর্ট ধারাবাহিকভাবে অনেকগুলো আদেশের মাধ্যমে বিচারাধীন বন্দিদের নির্যাতন এবং পীড়াদায়ক আচরণ থেকে রক্ষা করতে ভূমিকা রেখেছেন।

ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৪ ধারা পুলিশকে শুধু সন্দেহের ভিত্তিতে যে কোনো ব্যক্তিকে পরোয়ানা ছাড়াই গ্রেফতারের ক্ষমতা দিয়েছে। আবার, কার্যবিধির ১৬৭ ধারা অনুযায়ী একজন ম্যাজিস্ট্রেট গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিকে তথ্য ও সাক্ষ্য আদায়ের জন্য জিজ্ঞাসাবাদ করতে পুলিশ হেফাজতে পুনঃপ্রেরণ (রিমান্ড) করতে পারে। তবে একই ধারার ৩, ৪ এবং ৪(ক) উপধারায় পুলিশ হেফাজতে পুনঃপ্রেরণ সম্পর্কিত উল্লিখিত বিধানের অপব্যবহার রোধে রক্ষাকবজেরও বিধান রয়েছে।

২০০৩ সালে হাইকোর্ট *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ*[২] মামলায় প্রদত্ত রায়ে সংবিধানের সাথে অধিকতর সামঞ্জস্যপূর্ণ করার লক্ষ্যে উল্লিখিত ধারাগুলোকে সংশোধন করতে সরকারের প্রতি নির্দেশ দেয়। সরকার এই রায়ের বিরুদ্ধে আপিল করায় স্বাভাবিকভাবেই এই বিধানগুলো এখন পর্যন্ত সংশোধন করা হয়নি। হাইকোর্টের এই নির্দেশনা অনুসারে, পুলিশ রিমান্ডে পরিচালিত জিজ্ঞাসাবাদ অবশ্যই সুনির্দিষ্ট পদ্ধতিতে এবং সুনির্দিষ্ট স্থানে–জেলখানার ভেতরে কোনো কক্ষে, যার একটি দেয়াল কাচ ঘেরা স্বচ্ছ হবে, করতে হবে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আইনজীবী বা স্বজন ইচ্ছা করলে জিজ্ঞাসাবাদ পর্যবেক্ষণের জন্য ঐ কক্ষের বাইরে উপস্থিত থাকতে পারবেন।

হাইকোর্টের এরূপ নির্দেশনা থাকা সত্ত্বেও জেলগেটে অথবা গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন বা আইনজীবীর উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করার ঘটনা

---

২ *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ*, ৫৫ ডি এল আর (২০০৩), পৃ. ৩৬৩।

ঘটেছে কদাচিৎ। তবে ২০০৮ সালে সাবেক প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা, খালেদা জিয়া এবং খালেদা জিয়ার ছেলে তারেক রহমান, আরাফাত রহমান এবং খালেদার মন্ত্রিসভার কয়েকজন সদস্যের জেলগেটে এবং কিছু ক্ষেত্রে আইনজীবীদের উপস্থিতিতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে।[৩]

জিজ্ঞাসাবাদের সময় গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির কাছ থেকে তথ্য আদায়ের জন্য নির্যাতনকে একটি হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করা হয়, আইন প্রয়োগকারী সংস্থার এরূপ যুক্তি সম্পর্কে *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ*[৪] মামলার রায়ে আদালত মন্তব্য করেন, সংবিধানের ৩৫ অনুচ্ছেদের নিরিখে অভিযুক্তকে রিমান্ডে নিয়ে নির্যাতনের মাধ্যমে আদায়কৃত তথ্য সাক্ষ্য হিসেবে বিবেচিত হতে পারে না এবং অভিযুক্তের বিরুদ্ধে এসব তথ্য ব্যবহৃত হতে পারে না। রিমান্ডে নিয়ে বলপ্রয়োগের মাধ্যমে তথ্য আদায় 'সংবিধানের আদর্শ (স্পিরিট) এবং বিধানের সম্পূর্ণ বিরোধী' বলে হাইকোর্ট মত দেন।

২০০৮ সালে হাইকোর্টের এই নির্দেশনাসহ নির্যাতনবিরোধী অন্যান্য আইনি রক্ষাকবচের লঙ্ঘনের ঘটনা নিয়মিতই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে।[৫]

ঘটনাপঞ্জি

পত্রিকায় প্রকাশিত সংবাদ মতে, আইন-শৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর সদস্য কর্তৃক 'ক্রসফায়ার' বা 'এনকাউন্টারে' বিচার-বহির্ভূতভাবে কমপক্ষে ১৭৫ জনের মৃত্যু ঘটে। এসব বিচার-বহির্ভূত হত্যার ঘটনায় কখনো কোনো তদন্ত হয়েছে কিনা এ সম্পর্কে সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত কিছু প্রকাশ করা হয়নি (দেখুন, জীবনধারণের অধিকার সংক্রান্ত অধ্যায়)।

র‌্যাবের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নির্যাতনের শিকার জয়পুরহাট আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি

জয়পুরহাট আইনজীবী সমিতির সহ-সভাপতি অ্যাডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাকের ওপর নির্যাতনের অভিযোগ বিষয়ে ২০০৮ সালের এপ্রিল মাসে আসক পরিচালিত তথ্যানুসন্ধানে জানা যায়, ৩ এপ্রিল আনুমানিক ভোর ৩টার দিকে সাধারণ পোশাকের ছয়-সাতজনসহ র‌্যাবের পোশাক পরিহিত দু'জন বসতবাড়ি

---

৩ 'কোর্ট পারমিটস এসিসি টু কুইজ্‌ খালেদা, তারেক অ্যাট জেলগেট' *নিউ এজ*, ২১ জুলাই ২০০৮।

৪ *ব্লাস্ট বনাম বাংলাদেশ*, ৫৫ ডি এল আর (২০০৩), পৃ. ৩৬৩।

৫ বিস্তারিত দেখুন : *সাংবিধানিক অধিকার সংক্রান্ত আদালতের রায়* অধ্যায় ৩।

থেকে প্রায় ২০০ গজ দূরে মৎস্য পুকুরের কাছে অ্যাডভোকেট বিমান চন্দ্র বসাককে আটক করে। একটি মূর্তির সন্ধান চেয়ে তারা বিমান বসাককে নির্যাতন করে এবং হাত বেঁধে মাইক্রোবাসে করে একটি স্কুল মাঠে নিয়ে যায়। তার মুখে ও নাকে পানি ঢালে। এ সময় বিমান বসাককে রক্ষায় গ্রামবাসী জড়ো হলে র‍্যাব পরিচয়দানকারীরা ভয় দেখিয়ে তাদের তাড়িয়ে দেয়। এভাবে প্রায় এক ঘণ্টা নির্যাতনের পর তারা বিমান বসাককে ফেলে চলে যায়। পায়ের হাড় ভাঙাসহ গুরুতর আহত অবস্থায় বিমান বসাককে জয়পুরহাট হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। এ অপারেশন র‍্যাবের বগুড়া ক্যাম্প চালিয়ে থাকতে পারে– এ কথা উল্লেখ করে জয়পুরহাট র‍্যাবের ক্যাম্প কমান্ডার তার ক্যাম্পের কেউ এই ঘটনার সাথে জড়িত নয় বলে দাবি করেন। পরে তিনি আক্রমণকারীরা র‍্যাবের কোনো সদস্য নয় বলে দাবি করেন। আক্রমণকারীদের শনাক্ত করতে পারবে বলে বিমান চন্দ্র বসাকের পক্ষ থেকে বলা হলেও অভিযুক্তদের শনাক্তকরণ বা এ ঘটনার তদন্ত বিষয়ে এখন পর্যন্ত কিছু জানা যায়নি।[৬]

র‍্যাব কর্তৃক আটক হাসানকে আদালতে উপস্থিত করতে র‍্যাবের প্রতি হাইকোর্টের নির্দেশ

২৫ মে ২০০৮ র‍্যাব আটক করার পর থেকে নিখোঁজ হাসানকে সশরীরে আদালতে হাজির করতে কেন আদেশ দেয়া হবে না মর্মে ২৬ অক্টোবর ২০০৮ হাইকোর্ট র‍্যাবের প্রতি নোটিশ জারি করে তিন সপ্তাহের মধ্যে এর জবাব দিতে বলেন।[৭] আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) এবং হাসানের স্ত্রী হাসি বেগমের দায়ের করা এক রিট আবেদনের শুনানি শেষে আদালত এই আদেশ দেন। আসক-এর তথ্যানুসন্ধান সূত্রে প্রকাশ, ফৌজদারি মামলায় হাজিরা শেষে স্ত্রী হাসি বেগমসহ গাজীপুর আদালত থেকে ফেরার পথে ২৫ মে ২০০৮ র‍্যাব সদস্যের একটি দল কারণ না জানিয়ে টঙ্গীর দত্তপাড়ার হাসান খানকে গ্রেফতার করে। গ্রেফতারের পর মাইক্রোবাসে করে হাসানকে উত্তরার র‍্যাব অফিসে নিয়ে আসা হলে হাসানের স্ত্রী হাসি বেগম মাইক্রোবাস অনুসরণ করে র‍্যাব অফিসে হাজির হয়। কিন্তু তাকে অফিসে ঢুকতে দেয়া হয়নি। হাসানের খোঁজ জানতে চেয়ে আসক-এর পক্ষ থেকে

৬ আসক তদন্ত প্রতিবেদন. পুরো প্রতিবেদন দেখুন : www.askbd.org/web/wp- content/uploads/2008/08 joypurhat-adv-biman-final.pdf

৭ *আইন ও সালিশ কেন্দ্র বনাম বাংলাদেশ সরকার*, রিট পিটিশন নং ৭৮৯৪/২০০৮।

র‍্যাবের মহাপরিচালক বরাবর চিঠিও লেখা হয়। এসব চেষ্টায় কোনো ফল না পেয়ে আসক উল্লিখিত রিট মামলা দায়ের করে।[৮]

মৃত্যুর দুয়ার থেকে ফিরে আসা বাবুলের গল্প

মোহাম্মদ বাবুল (৩০) ঢাকাস্থ দক্ষিণ কেরানীগঞ্জের আগানগরের ইস্পাহানী এলাকার কাপড় ব্যবসায়ী। ২৪ জুলাই এক খরিদ্দারের কাছ থেকে পাওনা টাকা আনতে বুড়িগঙ্গার ওপারে কালীগঞ্জ গেলে র‍্যাব-১০-এর একটি টিম তাকে আচমকা গ্রেফতার করে এবং চোখ বেঁধে মাইক্রোবাসে করে নিয়ে যায়। কিছু দূর গিয়ে চোখের বাঁধন খুলে দেয়া হয়। বাবুলের ভাষ্যমতে, তাকে পোস্ত গোলার নির্জন মাঠে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে 'নিচে ফেলে তারা আমাকে বঁ-াধার চেষ্টা করে। আমি বাধা দেয়ার চেষ্টা করি। এ সময় র‍্যাবের সদস্যরা ফাঁকা গুলি করে এবং চিৎকার করে বলে, অপরাধী পালাচ্ছে, তাকে ধর, গুলি কর। তাদের একজন আমার বুকের ওপর উঠে আমাকে মারতে শুরু করে। একজন বলল, পায়ে গুলি কর। এরপর অন্য একজন আমার পায়ে গুলি করে। যন্ত্রণায় চিৎকার করলে অন্য একজন বললো, আবার গুলি কর, আমার পায়ে আর একটি গুলি করা হলো। পুরোটা সময় আমি আল্লাহর কাছে আমার জীবনের জন্য প্রার্থনা করছিলাম।' ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে শয্যাশায়ী বাবুল এভাবেই সাংবাদিকদের কাছে তার ওপর সংঘটিত নির্যাতনের কথা বর্ণনা করেন।

র‍্যাব বাবুলকে শীর্ষ সন্ত্রাসী বলে দাবি করে এবং র‍্যাব-১০-এর কমান্ডিং অফিসার এস এম কামাল হোসেন বাবুলকে পরিচিত জালিয়াতদের সিন্ডিকেট পরিচালনাকারী, কাপড় ব্যবসায়ীর বেশে একজন অপরাধী এবং নকল কাপড় বিক্রেতা বলে অভিযুক্ত করেন।[৯] র‍্যাবের ভাষ্যমতে, ২৫ জুলাই গ্রেফতারের পর (বাবুলের ভাষ্য মতে ২৪ জুলাই) বাবুলকে সঙ্গে নিয়ে তারা লুকিয়ে রাখা আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধারে যায়। বাবুলের সহকর্মীরা র‍্যাব সদস্যদের উদ্দেশে গুলি করে। এসময় পালিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করলে বাবুল গুলিবিদ্ধ হয়।

অতীতে একটি প্রতারণা মামলার সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি বাবুল স্বীকার করলেও অন্য কোনো অপরাধের সাথে জড়িত থাকার বিষয়টি সে অস্বীকার করে। বাবুলের এ বিবৃতি সমর্থন করে কোতোয়ালি থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা আব্দুল হান্নান মন্তব্য করেন, 'শীর্ষ সন্ত্রাসী তো দূরের কথা, অপরাধীর তালিকাতেই বাবুলের নাম নেই।'

---

৮ বিস্তারিত দেখুন: *ব্যক্তিস্বাধীনতার অধিকার* অধ্যায় ৫।

৯ 'মৃত্যুর দ্বার থেকে ফিরে আসা বাবুলের বিভীষিকাময় বর্ণনা', *সমকাল*, ২৯ জুলাই ২০০৮।

র‍্যাবের ক্রসফায়ারে পুত্রের মৃত্যুর ঘটনায় পিতা-মাতার তদন্ত দাবি

১৪ জুলাই ২০০৮ সকালবেলায় শ্যামপুর এলাকায় র‍্যাব-১০ সদস্যের ক্রসফায়ারে কোরিয়া ফেরত মোশাররফ হোসেন সেন্টু (২৮) এবং তাঁর দোকানদার বন্ধু রেজাউল করিম (২৭) নিহত হয়। ২৮ জুলাইয়ে এক সংবাদ সম্মেলনে তাদের মা-বাবারা জানান, স্থানীয় কিছু ভূমি দখলকারী এবং মাদক ব্যবসায়ীদের ইন্ধনে সাধারণ পোশাক পরিহিত র‍্যাব-১০-এর একটি দল বসতবাড়ির কাছে থেকে তাদের পুত্রদের তুলে নিয়ে যায়। এ ব্যাপারে র‍্যাব-১০-এর সাথে যোগোযোগ করা হলে তারা গ্রেফতারের বিষয়টি অস্বীকার করে। স্থানীয় লোকদের মাধ্যমে তাদের ছেলেদের মৃত্যুর কথা জানতে পেরে ১২ জুলাই রাতে আবার তারা র‍্যাব অফিসে গেলে তাদের শ্যামপুর থানায় যোগাযোগ করতে বলা হয়। সংবাদ সম্মেলনে নিহতের মা-বাবারা জানান, তাদের ছেলেদের বিরুদ্ধে অপরাধের কোনো রেকর্ড নেই। স্থানীয় লোকজনের সাথে অপরাধের বিরুদ্ধে তারা কাজ করত বলেই তাদের এই প্রতিহিংসার শিকার হতে হলো। এ ঘটনায় সঠিক তদন্ত এবং দায়ী ব্যক্তিদের বিচার দাবি করে নিহতদের পরিবারের পক্ষ থেকে র‍্যাবের মহাপরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করা হয়।[১০] এখন পর্যন্ত এ ঘটনা তদন্তের কোনো খবর জানা যায়নি।

র‍্যাবের হেফাজতে নির্যাতনের অভিযোগ সংক্রান্ত নিম্নের ঘটনাগুলোও বি-ভন্ন সময় পত্রিকায় প্রকাশিত হয়েছে; তবে এসব অভিযোগের প্রেক্ষিতে গৃহীত পদক্ষেপ সম্পর্কে পরিষ্কার কোনো তথ্য জানা যায়নি।

- ঢাকার লালবাগে র‍্যাব-১০ ক্যাম্পের ভেতরের আবাসিক কোয়ার্টারে কর্মরত হাবিবুল্লাহকে (১০) ২২ মে ২০০৮ শরীরে জখমের চিহ্নসহ মৃত অবস্থায় পাওয়া যায়।[১১]
- শরীয়তপুর জেলার চরেরকান্দির বিনোদপুর গ্রামের মোঃ আফজাল খান (২১) ১৮ মার্চ ২০০৮ র‍্যাব-৮- এর একটি দল কর্তৃক গ্রেফতার হওয়ার পর ২০ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজে মারা যায়। আফজালের পিতা বাংলাদেশ সেনাবাহিনীর অবসরপ্রাপ্ত সুবেদার আব্দুর রহমান জানান, ২১ মার্চ ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল মর্গ থেকে মৃতদেহ সংগ্রহের সময় তিনি আফজালের দেহে অসংখ্য আঘাতের চিহ্ন দেখতে পান। আফজালের কপালের বাম পাশে, বুকে, ঠোঁটে, মাড়িতে এবং মাথার খু-

---

১০ 'প্যারেন্টস্ ডিমান্ড ইনভেসটিগেশন অন সনস' ডেথ ইন র‍্যাব ক্রসফায়ার', *নিউ এজ*, ২৯ জুলাই ২০০৮।

১১ 'বয় ফাউন্ড ডেথ ইন র‍্যাব মেস', *দি ডেইলি স্টার*, ২৩ মে ২০০৮।

লির পেছনের অংশে আঘাতের চিহ্ন ছিল। তার ঘাড় ও বাম পাশে ভাঙা ছিল। পেট ফোলা ছিল। তাছাড়া রক্তের ছোপসহ পায়ের রগ ছেঁড়া দেখতে পাওয়া যায়।[১২]

পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ

নিম্নের ঘটনাসহ ২০০৮ সালে পুলিশি নির্যাতনেরও বিভিন্ন অভিযোগ প্রকাশিত হয়েছে:

- থানার পুকুরে গোসল করার কারণে ১৬ মার্চ ২০০৮ বেকারি শ্রমিক নজরুল ইসলামকে পিটিয়ে তার পা ভেঙে ফেলে মুন্সীগঞ্জের শ্রীনগর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা কামরুল ইসলাম।[১৩]
- গ্রেফতার এড়াতে জনৈক ব্যক্তিকে সহায়তা করার অভিযোগে ১৭ মার্চ ২০০৮ ভোর তিনটার দিকে মানিকগঞ্জের সাটুরিয়া থানার নয়াপাড়া গ্রামের মুনসুর আলী (৪৫) এবং তার কলেজ পড়ুয়া মেয়ে রহিমা আক্তার পুলিশ নির্যাতনের শিকার হয়।[১৪] দুটি ঘটনার কোনোটিতেই কোনো মামলা হয়নি।

পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণ

বীমা কোম্পানির মাঠকর্মীকে পুলিশ হেফাজতে ধর্ষণের অভিযোগে রাজশাহীর বোয়ালিয়া থানার সহকারী সহ-পুলিশ পরিদর্শকের বিরুদ্ধে মামলা নথিভুক্ত করা হয় ৯ অক্টোবর ২০০৮। মামলার প্রাথমিক তথ্য বিবরণী থেকে জানা যায়, সহকারী সহ-পুলিশ পরিদর্শক ফারুক ফোনে ভিক্টিমকে বিরক্ত করতো এবং ঘটনার দিন বিকেলে অপর সহকারী সহ-পরিদর্শক হামিদকে নিয়ে সে ভিক্টিমের বাড়িতে যায়। ভিক্টিম তার মার সাথে থাকতো। পুলিশ

---

১২ 'ফ্রুট ভেন্ডার বিটেন বাই র‍্যাব টু ডেথ', *নিউ এজ*, ২৬ জুন ২০০৮।

১৩ আসক তদন্ত প্রতিবেদন।

১৪ *প্রাগুক্ত*।

পরিচয় দিয়ে ধর্ষণকারী ভিক্টিমকে ভয় দেখায় এবং ধর্ষণ করে। পরে ভিক্টিম তার মাকে ঘটনা বললে জনৈক আলমের সহায়তায় ভিক্টিমের মা ভিক্টিমকে ওয়ান স্টপ ক্রাইসিস সেন্টারে ভর্তি করে। মামলা দায়েরের পর থেকে প্রাথমিক তথ্য বিবরণীতে উল্লিখিত এ এস আই আব্দুল হামিদ এবং তার সঙ্গী ফারুক পলাতক।[১৫]

পূর্বের নির্যাতনের ঘটনায় অব্যাহতি

রাংলাই ম্রো বিষয়ে সাম্প্রতিক তথ্য

পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো জাতিগোষ্ঠীর সম্প্রদায় প্রধান রাং লাই ম্রো চট্টগ্রাম জেলা কারাগারে বন্দি। অনুমোদনহীন পিস্তল রাখার অভিযোগে ২০০৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে তাকে গ্রেফতার করা হয়। পিস্তলটির অনুমোদন আছে বলে রাং লাই ম্রোর আইনজীবী আদালতকে অবহিত করলেও গ্রেফতারের চার মাস পর তাকে ১৭ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়।

গ্রেফতারের পর বান্দরবান সেনানিবাসের স্থানীয় সেনা সদর দফতরে সেনা কর্মকর্তাদের দ্বারা রাংলাই ম্রো মারাত্মকভাবে প্রহৃত হয়। এই নির্যাতনের বিষয়ে কখনও কোনো তদন্ত হয়নি। চিকিৎসার জন্য তাকে বান্দরবান জেনারেল হাসপাতালে ভর্তি করা হলে রাংলাই ম্রো হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হয়েছেন বলে চিকিৎসকরা শনাক্ত করেন। কিন্তু উপযুক্ত চিকিৎসা ছাড়াই তাকে আবার জেলে ফেরত নিয়ে যাওয়া হয়। ২০০৭ সালের অক্টোবর মাসে তার স্বাস্থ্যের আরো অবনতি হলে তাকে আবারও হাসপাতালে নেয়া হয়। চিকিৎসকরা উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম সম্পন্ন হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজনীয়তার কথা বললেও স্বাস্থ্যের কোনো উন্নতি ছাড়াই তাকে আবারও জেলে ফেরত আনা হয়। এ অবস্থায় হার্ট অ্যাটাকের ঝুঁকির মধ্যে তার স্বাস্থ্য ক্রমশই অবনতির দিকে।

সরকার এ বছর ডজনেরও অধিক বন্দিকে বিশেষ চিকিৎসার জন্য উন্নত চিকিৎসা সরঞ্জাম সম্পন্ন হাসপাতালে স্থানান্তর করলেও রাংলাই ম্রোর ক্ষেত্রে এরকম কোনো ব্যবস্থা নিতে দেখা যায়নি। এসব বন্দির অনেককে আবার চিকিৎসার জন্য বিদেশ যাওয়ার অনুমতিও দেয়া হয়েছে। রাংলাই ম্রোর উপযুক্ত চিকিৎসা নিশ্চিত করতে ত্বরিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের প্রধান উপদেষ্টা বরাবর পাঁচ সংগঠন এবং বিশিষ্ট ব্যক্তিরা জরুরি আবেদনও করেছেন। রাংলাই ম্রোর মামলায় ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণে মারাত্মক ব্যর্থতা ঘটেছে বিশ্বাস করে জরুরি এই আবেদনে রাংলাই ম্রোর মামলাটি বিশেষ

---

১৫ 'কপ গোজ ইন টু হাইডিং আপটার বিইং চার্জস্‌ড উইথ রেপ', *দি ডেইলি স্টার*, ১০ অক্টোবর ২০০৮।

করে জারিকৃত স্যাংশান আদেশ পুনর্বিবেচনা ও রাংলাই ম্রোর দ্রুত মুক্তির দাবি জানানো হয়।[১৬]

১৬ বান্দরবান জেলার সোয়ালোক ইউনিয়ন পরিষদ এবং ম্রো সামাজিক পরিষদের চেয়ারম্যান রাংলাই ম্রোর চিকিৎসা এবং দ্রুত মুক্তির দাবিতে স্মারকলিপি, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০০৮।